ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 958-964
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.090

গ্রন্থচিত্রে অনন্য: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’

ড. কাজল গাঙ্গুলী, *সহকারী অধ্যাপক, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 25.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

By illustration, we generally understand the type of a picture drawn following a text. The writer expresses the thoughts of the mind in language, words are his medium. In the other ways the painter visualizes that thought in paint, brush, and line movement. Literature and painting are two mediums of art, they are different in nature, and their expression is also unique. Despite being two different temperaments, they often take refuge in each other and become fellow travelers in illustrated books. In this way, we witness the close proximity of the two art forms in an illustrated book. The connection between book illustrations and children's literature is inseparable and very close. This interdependent activity of reading books and looking at pictures began in the early 19th century. The printing of books according to the influence and style of European illustration gradually became a habit. In 1907, ‘Thakumar Jhuli’ was published by Bhattacharya & Sons at the initiative of Dinesh Chandra Sen. Dakshinaranjan himself never studied painting. Self-taught, Dakshinaranjan was skilled in pencil sketches and woodcuts. He used to draw the illustrations for his books himself. The book has a total of 84 images, both large and small. There is a three-color image on the frontispiece. Below the images, there are references to the sentences or sometimes phrases of the story based on the images. The book 'Thakumar Jhuli' is still appreciated in every Bengali household even after a century due to the combined artistic qualities of the story and the images.

গ্রন্থচিত্র (Illustration) বলতে আমরা সাধারণভাবে সেই ধরনের ছবিকে বুঝি যা সেই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিষ্ট। অর্থাৎ কোনও লেখার অনুসরণে আঁকা ছবি। সাহিত্যিকের কাজ মনের ভাবকে ভাষায় রূপদান, শব্দ তার মাধ্যম, চিত্রকর সেই ভাবেরই দৃশ্যায়ন ঘটান রং-তুলিতে, রেখার চলনে। গ্রন্থচিত্রী সাহিত্যকে আশ্রয় করে ছবি আঁকেন, উদ্দিষ্ট সাহিত্যই তাঁর মনোলোকে সৃষ্টির প্রাথমিক উৎস। এই উৎসের সন্ধান পান তিনি একজন সহৃদয় পাঠক হিসেবে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্য গ্রন্থরূপ পাওয়ার আগেই পৌঁছে যায় অন্য এক ‘শিল্পী’ পাঠকের দরবারে। যেখানে শিল্পী শুধুমাত্র সাহিত্যের রসাস্বাদনই করেন না, পাশাপাশি তাঁর মনোজগতে চলে নবসৃষ্টির জন্য এক অন্বেষণ। একদিকে গ্রন্থপাঠ অন্যদিকে সেই পাঠকে দৃশ্যায়িত করার জন্য রসদ সংগ্রহ— শিল্পীমনের যুগপৎ সক্রিয় চলনে সাহিত্য সচিত্র হয়ে ওঠে। এইভাবে দুটি শিল্পমাধ্যম কাছাকাছি আসে এবং পরস্পরের পোষকতা করে।

সাহিত্য ও গ্রন্থচিত্র:

সাহিত্য ও চিত্রকলা— শিল্পকলার দুই মাধ্যম, এরা স্বভাবে ভিন্ন, প্রকাশরীতিও স্বতন্ত্র। দুই ভিন্ন মেজাজের হয়েও অনেকসময় তারা পরস্পরকে আশ্রয় করে একটি সচিত্র গ্রন্থে সহযাত্রিক হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে চিত্রকর যেমন নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটান, অন্যদিকে একটি ছবি কখনও কখনও লেখকের কাছে প্রেরণার মূর্তরূপ হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে একটি সচিত্র গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই শিল্পরূপের নিবিড় সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ করি।

সাহিত্যের মূলগত ভাবকে গ্রন্থচিত্রী আরেক রূপ দেন। গ্রন্থচিত্র কখনোই সাহিত্যের পরিপূরক নয়, রচনার ফাঁক পূরণ করা এর কাজও নয়। একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থচিত্র বরং লেখাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গ্রন্থচিত্র সাহিত্যের অনুসারী হয়েও প্রকাশে স্বাধীন। সাহিত্যের সমগ্রতা গ্রন্থচিত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে এমন দাবিও অসঙ্গত। কারণ লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিল্পী ছবির ভাব এবং কাঠামোটি গড়ে তোলেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর একটা দায়বদ্ধতা থাকে সমান্তরালভাবে শিল্পরস সৃষ্টি করার যাতে লেখাটির একটি নান্দনিক দৃশ্যকল্প বা ভিস্যুয়াল তৈরি করে পাঠকের কাছে লেখাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়। রচনার ভাবটিকে ছবির মাধ্যমে রূপ দিয়ে গ্রন্থচিত্রী পাঠককে এক নতুন রসলোকের সন্ধান দেন। জার্মান লেখক টমাস মান Death in Venice-এর Illustrator উলফগং বর্ণকে তাঁর গ্রন্থচিত্র সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

> "It has given me great pleasure to study your graphic fantasies on my story Death in Venice. For the writer it is flattering and moving experience to have a product of his mind taken up, reproduced, celebrated, glorified by an art that appeals more directly to the senses— graphic art or the theatre, say. In this case, however your illustration seems in fact to have produced a spiritualization of the subject, or at any rate a strong emphasis on and summoning up of its spiritual elements— which surely is the happiest thing that can be said about an illustrative work or a theatrical performance... what I like best about your lithographs is that they remove the novella entirely from the naturalistic sphere, purging it of pathological and sensational elements and leaving only the poetic quality."[১]

এক শিল্পের অন্য শিল্পমাধ্যমে রূপান্তর, যা প্রাথমিক মাধ্যমটিকে গৌরবান্বিত করে, পাঠকের অনুভূতির আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেয়— মানের কাছে এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। শুধু তাই নয় বর্ণের ছবিগুলি এক্ষেত্রে যা ঘটিয়েছে তাকে বলা যায়— 'Spiritualsation of the subjects'। টমাস মান তাঁর লেখা এই চিঠিটিতে গ্রন্থচিত্রের এক অসীম সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত দিলেন। এই চিঠিতেই শিল্পী বর্ণ সম্পর্কে লিখলেন— 'But since you, the artist, hit on the secret behind my words...'। গ্রন্থচিত্র বিষয়গত দিক থেকে সাহিত্যে একটি অন্যমাত্রা যোগ করে। পাঠকমনে সাহিত্য আরও সংবেদী হয়ে উঠতে পারে গ্রন্থচিত্র সহযোগে। এরকমই একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন নন্দলাল বসুকে:

> "তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয়, আর্টে সুন্দর হবার জন্য সুন্দর হবার কোন দরকারই হয় না। আর্টের কাজ মন টানা মন ভোলানো নয়।"[২]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই চিঠি লিখছেন তখন তিনি নন্দলালের বেশ কিছু পোস্টকার্ডের উপর আঁকা ছবি অবলম্বনে 'ছড়ার ছবি' রচনায় মগ্ন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উদ্ধৃত চিঠি দুটি লিখছেন দুজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, যাঁদের লিখছেন তাঁরা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। দুটি চিঠিতেই ছবি সম্পর্কে তাঁদের মহত্তর ধারণা প্রকাশিত। শুধুমাত্র চিঠি দুটির প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রথমটিতে সাহিত্য অবলম্বনে আঁকা হয়েছে ছবি, দ্বিতীয়টিতে ছবির রূপলোক থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছে সাহিত্য। দেখা যাচ্ছে, দুটি শিল্পমাধ্যম স্বভাবে স্বতন্ত্র হয়েও এক থেকে অন্যে তাদের ভাব সঞ্চারিত করে দেয় অনায়াসে। ভাবের এই চলাচল অবাধ এবং তা পরিপূর্ণতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে লেখক ও শিল্পীকে।

গ্রন্থচিত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি পৃষ্ঠাকে শোভিত করা নয়, তাকে হতে হবে লেখকের বিষয়-অন্বিষ্ট, এমনটাই মনে করতেন জার্মান মহাকবি গ্যেটে। তাঁর মতে 'The artist must think out to the end the poet's idea.'[৩]

বিষয়-সম্পৃক্ত হয়েও গ্রন্থচিত্রকে হয়ে উঠতে হয় বিষয়াতিরিক্ত। তার আবেদন পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্যবোধ ও বোধির কাছে। অন্বিষ্ট বিষয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অন্য এক রেখ্যভাষা নির্মাণের উপরই তার সার্থকতা নির্ভর করে। একটি উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণ কখনোই কবিতা বা গল্পের যে কাহিনি তার চিত্রানুবাদ নয়, অতিরিক্ত কিছু ব্যঞ্জনা সে যোগ করে। শিল্পী একটি সাহিত্যগ্রন্থকে চিত্রায়িত করে তোলার সময় নিরাসক্ত থাকেন। তাঁর দায়বদ্ধতা একদিকে যেমন থাকে সাহিত্যের ভাবের প্রতি অন্যদিকে তাঁর মন ক্রিয়াশীল থাকে নিজ শিল্পসৃষ্টির প্রতি। গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমে তিনি নিজের শিল্পীসত্তার প্রকাশ করেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই লেখককে ছাপিয়ে নিজেকে বড়ো করে দেখানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নেন না। যেমনটা দেখা যায় মধ্যযুগীয় গ্রন্থগুলিতে, ঐস্লামিক সংস্কৃতিতে গ্রন্থচিত্রণ এতই উচ্চমানের যে সেখানে লেখকের সৃষ্টি হয়ে পড়েছে গৌণ। আবার গ্রন্থচিত্রী নিছক অলংকরণও করে তুলতে চান না তার গ্রন্থচিত্রণকে। গ্রন্থচিত্রণেও প্রকাশ পাবে তাঁর শিল্পিত মনের নান্দনিকবোধ। উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণে থাকে লেখার সঙ্গে আঁকার এক ভারসাম্য। একটি লেখায় কবি বা লেখক গড়ে তোলেন যে শ্রব্যপ্রতিমা, শিল্পী তাঁর রঙে ও রেখায় তাকে রূপান্তরিত করেন দৃশ্যপ্রতিমায়। লেখার অন্তলীন যে ভাবগত নির্যাস, তা শিল্পীকে উদ্দীপিত করে দৃশ্যপ্রতিমা সৃষ্টিতে। যে দৃশ্যপ্রতিমা লেখার ভাব সাপেক্ষ হয়েও স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট। লেখক ও শিল্পী সৃষ্ট দুই প্রতিমার স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে তাদের যে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও টানাপোড়েন তাতেই সৃষ্টি হয় এক সমন্বিত শিল্পপ্রতিমার রূপ। এই সমন্বিত প্রতিমা সৃষ্টিই আধুনিক গ্রন্থচিত্রণের মূলকথা।

গ্রন্থচিত্র যখন শিশুকল্পনার দোসর:

শিশুসাহিত্যে গ্রন্থচিত্রণের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা— এ প্রশ্ন উঠলে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে, শিশুসাহিত্য এমন এক বিষয় যেখানে ছবি ছাড়া বইয়ের শিশুমনে কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে লুইস ক্যারলের 'Alice's Adventure in Wonderland' গল্পের শুরুটা মনে পড়ে। একদিন অ্যালিস নদীর পাড়ে তার বোনের সঙ্গে অলস সময় কাটাচ্ছিল। তার পাশে বসা বোনের হাতে খোলা একটি বইয়ের পৃষ্ঠায় সে উঁকি দেয়। কিন্তু সেই বইয়ে কোনও ছবি না থাকায় হতাশ অ্যালিস মনে মনে ভাবে: "and what is the use of a book without pictures…?" অ্যালিসের মতো সব কালের সব দেশের শিশুমন কল্পনাবিলাসী। শিশুমনের কল্পনা ডানা মেলতে চায় লেখার পাশাপাশি বইয়ের ছবিকে সঙ্গী করে। লেখকের পক্ষে শিশুমন জয় করা অনেক সহজ হয়ে যায় যদি তার লেখাটি হয় সচিত্র। রূপকথার গল্পে তেপান্তরের মাঠ, দৈত্যদানোর চেহারা, রাজপ্রাসাদ, রাজারানি, রাজপুত্রের পোশাক— এসব কেমন দেখতে? তাদের মনের মধ্যে ভিড় করে আসা এরকম অজস্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজে শিশুরা কথা-সংলগ্ন ছবির কাছে। এ প্রসঙ্গে শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থচিত্রী কৃষ্ণেন্দু চাকীর উপলব্ধি:

> "ছোটদের ছোট ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়ার আগে মনে রাখা ভাল তাদের মত কঠোর সমালোচক কিন্তু খুব কমই হয়।… তাদের কোনও ছবি ভালো লাগলে সে থেকে তারা ঠিক কী ধরনের আনন্দ পাচ্ছে সেটা গুছিয়ে বলার মত দক্ষতা তাদের থাকে না, তাই ছোটদের উপভোগের জগতটা সবসময়ই কিছুটা রহস্যময়।"[৪]

বাংলা শিশুসাহিত্যের রত্নভান্ডার অনেক বিশিষ্ট শিল্পীদের হাতে রঞ্জিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। তাই শিশুসাহিত্যের সঙ্গে গ্রন্থচিত্রের যোগ অবিচ্ছেদ্য ও অত্যন্ত নিবিড়।

গ্রন্থচিত্রে স্বদেশিয়ানা:

বইপড়ার পাশাপাশি ছবি দেখা, এই পরস্পর নির্ভর ক্রিয়াকর্মের শুরু উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই। গোটা উনিশশতক জুড়েই তাই নানা ধরনের বইয়ে কাঠখোদাই, ধাতুখোদাই, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি মাধ্যমে মুদ্রিত হতে থাকে অজস্র সব ছবি। ইউরোপীয় চিত্রাদর্শের প্রভাব ও রীতি মেনে বই ছাপানো ক্রমশ একটা কেতা হয়ে উঠতে থাকে। গ্রন্থচিত্রের করণকৌশল ও বিষয় অভিমুখ ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। বাংলার গ্রন্থচিত্রকরদের কাছে উনিশ শতকের শেষের কয়েকটি দশক বেশ বিভ্রান্তির। এই

সময় বাংলা ভাষায় চিত্রিত গ্রন্থগুলি ইউরোপীয় গ্রন্থসজ্জাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলছিল। গ্রন্থচিত্রকর কৃষ্ণেন্দু চাকীর ভাষায়:

> "বইয়ের অলংকরণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে তখনো চলে আসছিল ইউরোপের বহু ব্যবহৃত জরাজীর্ণ মধ্যযুগীয় সব নকশা। যেগুলো বাংলা বইয়ে ব্যবহার করার না আছে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না আছে বাংলার মাটি বা বাঙালির সঙ্গে সেগুলোর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।"[৫]

বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থচিত্রে ইউরোপীয় প্রভাব মুক্তির একটা চেষ্টা শুরু হয় জোর কদমে। উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন ব্লকের ছবি কিংবা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সচিত্র বইগুলিতে বাংলার নিজস্ব চরিত্র রূপ পেতে শুরু করে ও সেই সব ছবি বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্নবহ হয়ে ওঠে। এঁদের হাত ধরে বাংলা গ্রন্থচিত্রের স্বতন্ত্র পথ অন্বেষণের একটা চেষ্টা শুরু হয, তাতে যোগ্য সঙ্গত দেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও প্রেরণায় মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে থাকা রূপকথাগুলি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন দক্ষিণারঞ্জন। তিনি এই গল্পগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে। দক্ষিণারঞ্জনের লেখনীর গুণে এই সংগৃহীত গল্পগুলি হয়ে ওঠে শিশু মনোরঞ্জক। গ্রাম বাংলার পল্লীজীবনে দৈনদিন অভাব অনটনের মধ্যে এই গল্পগুলি ছিল দুঃখমোচনের একমাত্র বীজমন্ত্র। বাস্তবে যা অধরা, রূপকথার কল্পিত জগতে অনায়াসে তার নাগাল পাওয়া যায়, শ্রোতা ও বক্তার মানসিক দৈন্য কিছুটা হলেও পূরণ হয়। স্বপ্নে সাধ মেটে। ক্লান্তিকর একঘঁয়ে দিনযাপনের মধ্যে রূপকথাগুলি হয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের চাবিকাঠি। গল্পের পরিণামে দুর্বলের জয় ঘোষিত হতে দেখা যায়। বাস্তব আর কল্পনার ভেদরেখা মুছে গিয়ে কথন ও শ্রবণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় কথক আর শ্রোতা— দুজনের মনের মধ্যেই জন্ম নেয় এমন এক অসম্ভবের রাজ্য যেখানে সব সম্ভব। এ এক সব পেয়েছির দেশ। সেখানে মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে ভয় পায় না রাজপুত্র। নিত্যদিনের হতাশা কাটিয়ে অসহায় জীবন সেখানে স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়ায়।

'ঠাকুমার ঝুলি' সচিত্র রূপকথা:

১৯০৭ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি'। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এ কাজের প্রশংসা করে লেখেন, "ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ?" দক্ষিণারঞ্জন শুধু রূপকথাগুলি সংগ্রহ করেই তার নটে গাছটি মুড়োতে দেন নি। সেগুলির শিল্পিত পরিবেশনে পাশাপাশি জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের হাতে আঁকা সব ছবি। দক্ষিণারঞ্জন নিজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেননি কোনদিন। স্বশিক্ষিত দক্ষিণারঞ্জন পেন্সিল স্কেচে দক্ষ ছিলেন। পাশাপাশি কাঠের শিল্পকর্মে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। নিজের বইয়ের ছবি তিনি নিজেই আঁকতেন। এরপর ছাপার প্রয়োজনে সেই সব ছবি কাঠখোদাইয়ের জন্য তিনি এনগ্রেভারদের সাহায্য নিতেন। 'ঠাকুমার ঝুলি'র আখ্যাপত্রে সেইসময়ের প্রসিদ্ধ খোদাইশিল্পীদের নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন প্রিয়গোপাল দাস, অরবিন্দ দাস, কুঞ্জবিহারী পাল, হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা প্রত্যেকেই খোদাইশিল্পী হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। বইটিতে ছোটবড় মিলিয়ে মোট ৮৪টি ছবি আছে। মুখপত্রে আছে তিন রঙের একটি রঙিন ছবি। আছে ছবিগুলির নীচে ছবি-আশ্রিত গল্পের বাক্য বা কখনো বাক্যাংশের উল্লেখ।

'ঠাকুমার ঝুলি'র ছবিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই চিত্রিত। ছবিগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার স্পর্শ আছে। আছে লৌকিক সহজ সরল ভাষা ও ভাবের অনবদ্য চিত্ররূপ। আখ্যান অনুসারী একরঙা ছবিগুলির কারণে গল্পগুলির পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় না। চৌকো ফ্রেমবন্দি ছবিগুলি গল্পকথার বিশেষ অংশকে দৃশ্যায়িত করে তোলে। সহজ ভাষা ও নির্ভার ছবির যুগপৎ চলনে সক্রিয় গল্পপাঠ দ্রুত এগিয়ে চলে। এই ছবিগুলি ছোটদের পড়ার আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে, কল্পনাকে খানিক উস্কে দেয়। গল্পের পরিপূরক

ছবিগুলির বিশেষত্ব এই, দক্ষিণারঞ্জনের আঁকা রাক্ষস খোক্ষসের ছবিগুলি মোটেই বীভৎস নয়, শিশুদের তারা ভয় দেখায় না বরং যেন হাসির খোরাক জোগায়। হিউমারধর্মী ছবিগুলি গল্পপাঠে অন্য মাত্রা যোগ করে। 'ঠাকুমার ঝুলি'র ছবিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই চিত্রিত। ছবিগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার স্পর্শ আছে। আছে লৌকিক সহজ সরল ভাষা ও ভাবের অনবদ্য চিত্ররূপ। আখ্যান অনুসারী একরঙা ছবিগুলির কারণে গল্পগুলির পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় না। চৌকো ফ্রেমবন্দি ছবিগুলি গল্পকথার বিশেষ অংশকে দৃশ্যায়িত করে তোলে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে ছবিতে রাক্ষসদের লোমশ চেহারা 'বাঁপ রেঁ— নাঁ জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ' (চিত্র ১) দেখলেই হাসি পায়। শিশুদের ভয় দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, এই ছবিগুলির মাধ্যমে তিনি সরলমতি শিশুদের হাসাতেই চেয়েছিলেন। গ্রন্থকারের নিবেদন-এ তিনি লিখেছেন সেকথা: "অবশেষে বসিয়া বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাঁদের কাছে দিতেছি তাহারা ছবি দেখিয়া হাসিলে, জানিলাম, আঁকা ঠিক হইয়াছে।" এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টিই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ছবিতে তরোয়াল হাতে রাক্ষস হত্যা আছে কিন্তু রক্তপাত নেই। এসব ছবি হিংসার নয়। "সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া যেন গিরগিটির ছা!" এই বর্ণনায় যেমন নিষ্ঠুরতা নেই, প্রাসঙ্গিক ছবিতেও (চিত্র ২) তেমনি কোনও ক্রূরতা নেই। শুধু আছে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার নির্মল আনন্দ।

'চ্যাং-ব্যাং'-পর্বের মুখপাতের ছবিটিতে আজগুবি কল্পনা ও এলোমেলো ভাবনার এক আশ্চর্য সমাবেশ। "কোথায় এত থলের ভিতর চিঁচিঁমিঁচিঁ রব?—/ চ্যাং-ব্যাং-এর বাসার মাঝে লুকিয়ে ছিল সব।" (চিত্র ৩) শিয়ালপন্ডিত, বুড়ো বামুন-বাম্নী, কাঠুরে বউ, কামার বুড়ো— এদের নিয়ে অভাবিত গল্পকথার এক মায়াবী জগত। 'শিয়াল পন্ডিত' গল্পে শিয়ালের পাঠশালায় পড়ে কুমিরের সাতটি ছেলে। অভিভাবক কুমির টোপর মাথায় দিয়ে চলেছে ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির খোঁজ নিতে। এই মুহূর্তের ছবিটি (চিত্র ৪) বেশ মজাদার। চ্যাং-ব্যাং-এর ছবিগুলির উদ্ভট মেজাজে পরবর্তীকালে সুকুমারের 'অসম্ভবের ছন্দ'- এর ছায়া, গ্রন্থচিত্রের অনিবার্য ভবিষ্যৎ যেন!

'কিরণমালা' গল্পে দুই দাদা অরুণ আর বরুণকে উদ্ধারের জন্য কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। "যায়,-- যায়,-- কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে; কে দেখে, কে না-দেখে! দিনরাত্রি, পাহাড় জঙ্গল, রোদ বান সকল লুটাপুটি গেল; ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়ে উঠিলেন। অমনি চারিদিক দিয়া দৈত্য, দানা, বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ, মোষ, ভূত পেত্নীতে আসিয়া কিরণমালাকে ঘিরিয়া ধরিল।" অপ্রাকৃত মায়াপাহাড়ের বর্ণনা শুধু ভাষায় নয় তার ছবিও দক্ষিণারঞ্জন এঁকেছেন পৃষ্ঠা জুড়ে। "পায়ের নীচে কত পাহাড় টলে গেল, কত পাথর গলে গেল।" এই ছবিটিতে (চিত্র ৫) হাতে তলোয়ার, আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত মুখে কিরণমালা নির্ভয় এগিয়ে চলেছে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে। কিরণমালা রাজকন্যা, এই গল্পের নায়ক। বীরত্বে রাজপুত্রদের চেয়ে কোন অংশে সে কম নয়। সোনাঝারি থেকে জল ছিটিয়ে দিতেই পাথরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে শত শত যুগের রাজপুত্ররা। তাদের সে মুক্ত করে। রাজপুত্ররা জীবন ফিরে পেয়ে কিরণমালাকে প্রণাম করে, 'সাত যুগের ধন্য বীর'। এই দ্বিতীয় ছবিটিতে (চিত্র ৬) কিরণমালার মুখে স্নেহের ভাব লক্ষণীয়। এখন আর সে শুধু অরুণ-বরুণ-এর বোন নয়, সে একইসঙ্গে বীরাঙ্গনা আবার জীবনদাত্রী। মা-ঠাকুমার মুখে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে শিশুর দু চোখে ঘুম নেমে আসে। শিশুর ঘুমের দেশ অবচেতনের স্বপ্নপুরী। কল্পরাজ্যে তার তখন অবাধ আনন্দভ্রমণ। ঘুমিয়ে পড়া খোকার ছবি 'আমসন্দেশ'-এর মুখপাতে (চিত্র ৭)। ছবিটির রেখার টানটোন অত্যন্ত নিখুঁত, উচ্চমানের কাঠখোদাইয়ের নিদর্শন। ঠাকুমার ঝুলির ছবিগুলির বিষয়ে উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করে কমলকুমার মজুমদার লিখেছেন:

"ঠাকুরমার ঝুলি যে একটি কত বড় কাজ, যে ইহা একটি সভ্যতা! কি ভাবে ইহারে পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া যায় তাহা আমাদের ভাবনাতে আসে না, আমরা শুধু আদেখিল্লার মতন ইহা স্পর্শ করি, আমরা চেতনা ফিরিয়া পাই। বঙ্গীয় ধারার প্রতি নিষ্ঠার ঐ শেষ নিদর্শন!... ছবির দিক দিয়া যাহা আমার মনে ধরিয়াছে, যেমন, এখানে অভিব্যক্তি, বাঙলা, প্রগ্রেসিভ যাত্রা নহে, আদত যাত্রাতে দেখা যায়!... ঠাকুরমার ঝুলিতে ছবিতে নাটক আছে। ঠাকুমার ঝুলির অন্যান্য বিকট উদ্ভট ছবিও এক সৃষ্টি। এখানে স্থাপত্য পশুপাখি বড় অভিনব! অভিব্যক্তি ছাড়া, এতাবৎ অনুসৃত ধরন আর নাই তবু ইহা বাঙলারই।"[৬]

উনিশ শতকের শেষের দিকেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে ছাপার জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ছাপাছবিতে প্রবেশ ঘটে হাফটোন পদ্ধতির। এতদিন ছবিতে যে দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিকতার আভাস দেওয়ার চেষ্টা ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। আসে আধুনিকতা, আসে সূক্ষ্মতা। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রকাশের সময় সে পথে হাঁটলেন না। তিনি ছবি ছাপার মাধ্যম হিসেবে কাঠখোদাইকেই বেছে নিলেন। কাঠখোদাই মাধ্যমটির প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই গ্রন্থে যে চারজন খোদাইশিল্পী কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সেইসময় বিখ্যাত ছিলেন প্রিয়গোপাল দাস। নিজের আগ্রহে, ভালোবাসায় ও জীবিকার তাগিদে তিনি কাঠখোদাই চিত্রে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাফটোন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশ কয়েকটি দশক জুড়ে ছাপার জগতে তাঁর হাতের কাজের নমুনা ছড়িয়ে আছে। প্রিয়গোপালের কাছ থেকে ভালো কাজ পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন লেখক, প্রকাশক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করে থাকতেন। দক্ষিণারঞ্জন দিনের পর দিন তাঁর কাছে বসে থেকে কাজ করিয়ে নিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের অন্যান্য বইগুলোতেও প্রিয়গোপালের কাঠখোদাইয়ের নিদর্শন আছে। প্রিয়গোপালের কাজের মাধুর্য স্বতন্ত্রতা দাবি করে। গল্প আর ছবির যৌথ শিল্পগুণে 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইটি শতবর্ষ পেরিয়ে এসে আজও বাঙালির ঘরে ঘরে সমাদৃত।

চিত্রসূচী:

প্রচ্ছদ: মিত্র ও ঘোষ, ১৪১২

চিত্র ১

চিত্র ২

চিত্র ৩

চিত্র ৪

চিত্র ৫

চিত্র ৬

চিত্র ৭

তথ্যসূত্র:

১. Maan, Thomas, Letters of Thomas Maan, 1889-1955 By, Selected and Translated by Richard & Clara Winston, University of California Press Barkeley, Los Angeles 1970

২. দে, অভীককুমার, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২

৩. দে, অভীককুমার, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২

৪. চাকী, কৃষ্ণেন্দু, ছবির বইয়ের আকর্ষণ চিরকালীন, এই সময় (দৈনিক), সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়, রবিবার, ১০ নভেম্বর ২০১৩

৫. চাকী, কৃষ্ণেন্দু, বাংলার গ্রন্থচিত্র, নবপত্রিকা, একদিন (দৈনিক), সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১মে ২০১১

৬. মজুমদার, কমলকুমার, বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ, উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ, সংকলন ও বিন্যাস: অশোক উপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১১।